নাগরিক সংবাদ

দূর পরবাস

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংস্কার: কল্যাণ ও কর্মসংস্থান পৃথক্‌করণ

লেখা: শেখ আলীমুজ্জামান, জাপান

প্রকাশ: ১২ নভেম্বর ২০২৪, ২১: ৫৯

গত শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় বাংলাদেশি কর্মী গমন শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের নামকরণে প্রবাসী কল্যাণ শব্দটি থাকলেও এর অভিলক্ষ্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান। মন্ত্রণালয়ের অধীন চারটি প্রতিষ্ঠান জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও পরিষেবা কোম্পানি (বোয়েসেল), মজুরি উপার্জনকারী কল্যাণ বোর্ড ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক—এর তিনটির কার্যক্রমই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিকেন্দ্রিক। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৭টি দেশে ২৯টি শ্রমকল্যাণ উইং নিয়োজিত রয়েছে; যদিও কোনো দেশেই প্রবাসী কল্যাণ উইং নেই। এই সুবিশাল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বিশ্বে প্রবাসীর মোট সংখ্যা সোয়া কোটি অতিক্রম করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান শর্ত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষ করে ডলার-পাউন্ডের

দেশমুখী প্রবাহ বৃদ্ধি করা। সম্প্রতি বিদেশি বিনিয়োগে ভাটা পড়েছে, পোশাক রপ্তানি কমেছে অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ও প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী আয়ের কোনো বিকল্প নেই। এই উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়টি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এবার একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্জনগুলো দেখা যাক। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) প্রবাসী আয় পাঠানো শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র। এরপরই মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব থাকলেও দেশের অর্ধেক রেমিট্যান্স আসছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় দেশগুলো, অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে। এসব দেশে প্রবাসীরা মূলত নিজ প্রচেষ্টায় গমন করেন, যার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা কম।

আবার ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিপ বলছে, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া শ্রমিকদের ৬২ শতাংশ অদক্ষ ও ৩৬ শতাংশ আধা দক্ষ। যদিও দেশে শতাধিক সরকারি-বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়ছে। এর সঙ্গে বিদেশি ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যোগ করলে দক্ষ জনশক্তি তৈরির বিশাল কর্মযজ্ঞের চিত্র ফুটে ওঠে। গত তিন যুগ জাপানে প্রবাসজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। আশির দশক থেকে জাপানে প্রবাসী কর্মী আসা শুরু হলে ২০০০ সাল পর্যন্ত জাপানে বাংলাদেশি প্রবাসীর সংখ্যা ৫০ হাজার অতিক্রম করে। তবে দক্ষ কর্মী কোটার ভিসা না থাকায় অধিকাংশকে দেশে চলে যেতে হয় এবং ২০২০ সাল নাগাদ সংখ্যাটি ১৫ হাজারে নেমে যায়। বর্তমানে জাপান-বাংলাদেশ কৌশলগত অংশীদারত্ব (স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ) সমঝোতার আওতায় সেটা আবার বেড়ে ২৫ হাজার হয়েছে। তবে এই পরিসংখ্যান প্রতিবেশী দেশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের প্রতিদ্বন্দ্বী নেপালের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ২০০০ সালে জাপানে নেপালের প্রবাসীদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের কম, যা অব্যাহতভাবে বেড়ে বর্তমানে দুই লাখ অতিক্রম করেছে। গত বছর চালু হওয়া বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-টোকিও রুটের সাপ্তাহিক ফ্লাইটের সংখ্যা কমেছে, তবে এখনো চালু রাখা যাচ্ছে নেপালি যাত্রীদের ভরসায়।

অথচ জাপান তিন কোটি জনসংখ্যার দেশ নেপালের পাশাপাশি জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে জাপানে কমপক্ষে ১১ লাখ বাংলাদেশি প্রবাসী থাকা যৌক্তিক ছিল। বাস্তবতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সরবরাহ—এ দুই ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতাতেই আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি।

গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের বড় ভূমিকা ছিল। বেশ কয়েকজনের ইউটিউব চ্যানেলের নিয়মিত ভিউ লাখের ওপরে, কেউ কেউ সরকারের বিপক্ষে কাজ করেছিলেন, শেষের দিকে অনেক শহরে বড় আকারের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। অর্থাৎ বিদেশে এসে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেলেও দেশের পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের ভেতরে প্রচণ্ড অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, তাঁরা একটি প্রবাসীবান্ধব কল্যাণ রাষ্ট্র চান এবং সেটি বিনির্মাণে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রত্যাশা করেন। এ ঘটনাপ্রবাহে প্রবাসীদের অসন্তোষের দুটি জায়গা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, নিপীড়ন, দুর্নীতি ও সামাজিক সুরক্ষাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে প্রত্যাবর্তনের

অনিশ্চয়তা। দ্বিতীয়ত, নিজেদের স্বল্প বেতনে বিদেশে কঠিন পরিশ্রম করতে হলেও অন্য দেশ থেকে স্বদেশে আসা বিপুলসংখ্যক কর্মীদের উচ্চ বেতনে কাজ করার সুযোগ দেওয়া।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিরা ১৩৭ মিলিয়ন ডলার নিজ নিজ দেশে পাঠিয়েছেন। যদিও বিশ্লেষকেরা মনে করেন, সঠিক সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, অনেকের দেশে কাজ করার বৈধ অনুমতি নেই। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুটি সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বিদেশের দূতাবাসগুলোয় শ্রমকল্যাণ উইংয়ের পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ উইং স্থাপন করে প্রবাসীদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক বন্ধন তৈরি করার প্রচেষ্টা। এর ফলে দেশে চালুকৃত নানা ধরনের কল্যাণমূলক স্কিমে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, যা দেশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে। সম্প্রতি দূতাবাসের শ্রমকল্যাণ উইং আয়োজিত কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে দেখেছি, প্রবাসীদের জন্য বেশ কয়েকটি কল্যাণ ও পুনর্বাসনমূলক স্কিম চালু করা হলেও সে সম্পর্কে অধিকাংশ প্রবাসীই জানেন না। শ্রমকল্যাণ উইংয়ের পরিবর্তে এগুলো প্রবাসী কল্যাণ উইংয়ের স্কিম হিসেবে তুলে ধরতে পারলে সবার আগ্রহ বাড়বে। বিদেশের প্রতিটি শহরে বা এলাকায় একটি করে প্রবাসী কমিউনিটি আছে, যা একেকটি ক্ষুদ্র বাংলাদেশের মতো। তাদের নিজস্ব আচার ও অনুষ্ঠান আছে, নানা ধরনের দল বা সমিতি আছে, এমনকি নানা ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রমও আছে; বরং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাসীরাই অপরাধ ও হুন্ডি ব্যবসার মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত হন। দূতাবাসে প্রবাসী কল্যাণ উইং থাকলে এসব গুছিয়ে এক ছাতার নিচে আনা যায় এবং আমি মনে করি, তা সম্ভব। একই সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে বিদেশের মাটিতে দেশবিরোধী প্রচারণা কিংবা নিজেদের ভেতরে হানাহানি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। এ অতি তৎপরতা দেশের ইমেজ সংকট সৃষ্টি করে এবং শ্রমবাজার সম্প্রসারণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের তিন প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সরবরাহ করা হয়, এগুলো প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একীভূত করা। দক্ষ জনশক্তির অভাবে বিদেশিদের উচ্চ বেতনে দেশে কাজ করার জন্য আসতে না দিয়ে স্বদেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটা প্রবাসী কল্যাণ নয়; বরং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পড়ে এবং একটি সমন্বিত কাঠামোতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী বৈদেশিক কর্মসংস্থান করাও সহজ হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী দেশগুলোর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান বলে আলাদা কোনো মন্ত্রণালয় নেই, এটি শ্রম মন্ত্রণালয়ে অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, ভারতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তো নেই, এমনকি প্রবাসী কল্যাণবিষয়ক কোনো মন্ত্রণালয়ও নেই। ভারতে ২০০৪ সালে প্রবাসীবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিজেপি সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এলে একই সঙ্গে প্রবাসীবিষয়ক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব পান সুপ্রিম কোর্টের সাবেক আইনজীবী ও দলের সিনিয়র নেতা সুষমা স্বরাজ। একসঙ্গে দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, প্রবাসীবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কাজ কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ কারণে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে দুই মন্ত্রণালয় একীভূত করার অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাঠালে প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মতি প্রদান করেন। প্রবাসীবিষয়ক মন্ত্রণালয়টি ২০১৬ সালে পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একীভূত করার কাজ সম্পন্ন হয়। এ উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমে জানান, সরকারের আকার ছোট করে সরকারি সেবা বাড়ানোর নীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছে। এবার দেখা যাক, এই সিদ্ধান্ত দেশটির রেমিট্যান্সের প্রবাহে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে। ভারত ২০১৫ সালে প্রবাসী কর্মীদের মাধ্যমে ৬৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স অর্জন করে। পরের বছরগুলোতে তা বাড়তেই থাকে এবং ২০২২ সালে ভারতের বাৎসরিক রেমিট্যান্স শত বিলিয়ন ডলার রেখা অতিক্রম করে ১১১ বিলিয়ন ডলারে ওঠে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে রেমিট্যান্স অর্জন করা দেশগুলোর তালিকায় বর্তমানে ভারতের অবস্থান শীর্ষে। প্রতিবেশী দেশের এই সাফল্য দেখে বাংলাদেশ কিন্তু একই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিগত সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে প্রায় দেড় গুণ বেশি কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব পদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একীভূত করে সেবা বাড়াতে পারলে মাথাভারী প্রশাসন হালকা হবে। সরকারের আকার ছোট করে সেবা বাড়ানো রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক।

নাগরিক সংবাদ

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো